আমার শিক্ষক অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতি সতত সুখের, যদি না তা ঝাপসা হয়ে আসে। আমার জীবনে অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্তের স্মৃতি কিছু উচ্চারিত কথা ও অনুষঙ্গে প্রায় আঠাশ বছরের—সেই ১৯৭০ সালে প্রথম পরিচয় থেকে ১৯৯৮ সালে তাঁর জীবনাবসান পর্যন্ত। স্মৃতির মায়াবী আলোয় অশীনবাবুর কথা আমার কাছে কখনই ঝাপসা হয়না, বরং আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এইজন্য যে সময়ের পর্বান্তরে তাঁর অনেক কথা নতুন তাৎপর্য পায়, অনেক অনুষঙ্গ আরো রহস্যময় হয়। ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতায় ভিন্নতর মাত্রা পায়। এ যেন একই সঙ্গে নানা অশীনবাবুর সমাহার। আমার অভিজ্ঞতায় অশীন-বাবু ১৯৭০ থেকে ১৯৯৮—ঠিক তাই। জীবনাবসানের পরে গত চোদ্দ বছরে তিনি আরো প্রকট হয়েছেন মাত্র।

১৯৭০ সালের গোড়াতেই অশীনবাবুকে প্রথম দেখি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ ক্লাসে আমাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে। এই প্রথম দেখার একটা প্রেক্ষাপট ছিল অবশ্যই। মফঃস্বল থেকে পড়তে এসেছি কলকাতায়, বয়েস বিশ বছর, আর একটা উথালপাতাল পরিবর্তনের বছর হল এই সত্তর সাল। অসম্ভব মেধাবী অশীনবাবুর নাম আগেই শুনেছি : ইতিহাসের ঈশান স্কলার, প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল সুবিদিত। তাঁর গ্রন্থ *Malabar in Asian Trade* মাত্র তিন বছর আগে কেমব্রিজ থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দর্শনে অশীনবাবু আমার কাছে আদ্যন্ত নাগরিক ব্যক্তিত্ব রূপেই প্রতিভাত হলেন। অত্যন্ত সংযতবাক, কিন্তু তীব্র, তীক্ষ্ণ ভাষণ তাঁর। আমাদের পড়াবেন ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারতের সমুদ্র বাণিজ্য। একবারও নিজের বই-এর নাম করলেন না, কিন্তু এমনভাবে একটি গ্রন্থ তালিকা দিলেন যেগুলি পড়া বাধ্যতামূলক। পড়া মানে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কিংবা ন্যাশনাল লাইব্রেরি। আবার পড়া মানেই অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্তের সঙ্গে বারে বারে দেখা হয়ে যাওয়া, কারণ সেই একই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে তিনিও পড়ছেন। সর্বদাই বলতেন অনেক পড়বে, আরো বেশি ভাববে, কিন্তু লিখবে সংক্ষেপে। ক্লাসের প্রথম দিকেই কিছু লিখতে বললেন, সম্ভবত ষোড়শ শতকে ভারতের সমুদ্র বাণিজ্যের কাঠামো সম্বন্ধে। সেই লেখা তন্ন তন্ন ভাবে দেখে দিলেন। খাতা ফেরৎ দিতে একটু দেরী হল বটে, কিন্তু যখন পেলাম মন ভরে গেল। অজস্র পাদটীকা সংযোজন করে তাঁর মন্তব্যগুলি লিখে দিয়েছেন, উজ্জ্বল হস্তাক্ষরে। সেই শুরু। তারপর তাঁর সঙ্গে প্রতিটি সাক্ষাৎই উল্লেখ্য স্মৃতি হয়ে আছে। তাঁর নিজের লেখা পড়তে দিলেন, বাড়িতে যেতে বললেন। মনে আছে উনি তখন ট্র্যাঙ্গুলার পার্কে থাকতেন, আমি দক্ষিণ কলকাতার কিছু চিনি না, উনি নির্দেশ দিলেন ট্রামে এসে দেশপ্রিয় পার্কের তিন স্টপ পরে নামবে। আমি জানতে চাইলাম দেশপ্রিয় পার্কটা কোথায়, উনি উত্তর দিলেন 'সেটা তুমি জেনে নেবে'। ওই সময় উনি ভারতের সমুদ্র বাণিজ্যের পটভূমিকায় সুরাট বন্দর নিয়ে কাজ করছেন, ওঁর অসাধারণ সুন্দর লেখাগুলি

পড়ছি এবং কিছু কিছু লিখছি। একবার বললেন, লেখা নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে আসতে। আমি লেখা পড়ে শোনালাম, আর উনি অসাধারণ মনোযোগে শুনলেন ও ওঁর সুচিন্তিত মন্তব্যগুলি করে গেলেন। কোনো লেখা যে এইভাবেও তন্ন তন্ন করে দেখে দেওয়া যায়, আমি এর আগে তা জানতাম না। সর্বোপরি, সব সাক্ষাতেই তাঁর অসাধারণ কথা, সে সবই উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে আছে।

সমগ্র সত্তরের দশক জুড়েই অশীনবাবু আমার কাছে এক অনবদ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন। এই সময় উনি ভারতীয় বণিক কূল ও সুরাটের পতনের ওপর গ্রন্থটির গবেষণা ও রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। অনেকে মনে করেন এই গ্রন্থটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। যতদূর মনে পড়ে ১৯৭২ সালে অশীনবাবু হাইডেলবার্গে চলে গেলেন ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে। প্রায় এক বছর ছিলেন। ওই সময় সুরাটের ওপর গবেষণাও চলছিল। একবার বালখিল্যের মতো সুরাটের সমুদ্র বাণিজ্য নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। প্রশ্নগুলির range একটু বড় ছিল, তখন জানতাম না গবেষণায় সব প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর হয় না। অশীনবাবু লিখলেন, 'তোমার প্রশ্নের সামনে আমি দাঁড়িয়ে ফেল'। আসলে বলতে চাইলেন এইসব প্রশ্নের চট-জলদি উত্তর হয় না। আরো জানতে চেয়েছিলাম, তাঁর নতুন আর

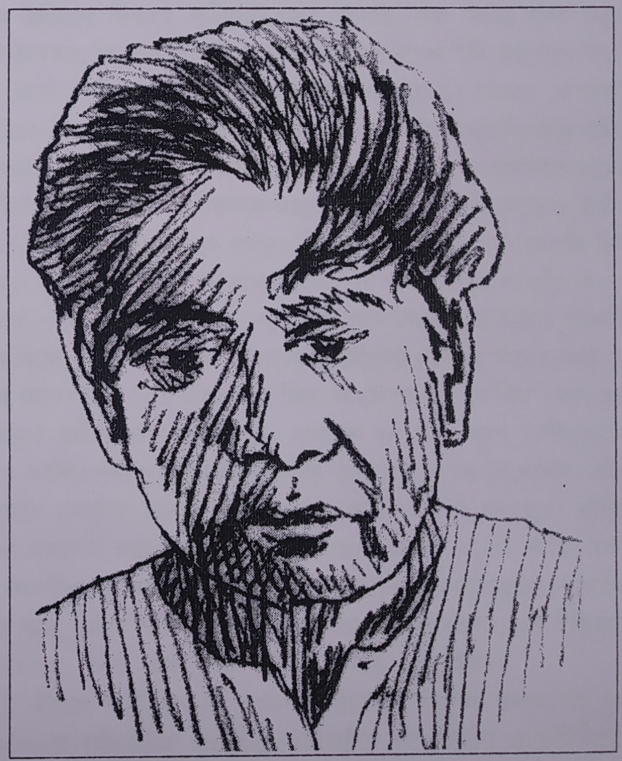

অশীন দাশগুপ্ত শিল্পী : চারু খান

অধ্যায়ের নামগুলি। উত্তরে লিখলেন, বই-এর নাম একটা ভেবেছেন কিন্তু অধ্যায়ের নামগুলি নিয়ে দিনে দু'বার মত পাল্টান। এর কিছুদিন পরে নানা কার্যকারণে অধ্যাপক দাশগুপ্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৯৭৪ সালে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগ দেন। ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের যাদবপুর অধিবেশনে ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের ওপর সভাপতির ভাষণ দেন। খুবই মর্মস্পর্শী ছিল সেই ভাষণ। এরপর অশীনবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয় ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আলিগড় অধিবেশনে, ১৯৭৫ সালে। সেই সময় আমি একটি প্রবন্ধ পড়ি এবং তার একটি কপি অশীনবাবুকে দিই। অবাক হয়ে দেখলাম, সেই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ সংশোধন করে আমাকে ফেরৎ দিলেন দিনের শেষে। সত্তরের দশকের শেষের দিকেই জার্মানি থেকে অশীনবাবুর সুরাটের ওপর গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। ১৯৭৮ সালে সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোসাল সাইন্স-এর উদ্যোগে আয়োজিত একটি সেমিনারে উনি সুরাট প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন, অসাধারণ তার দ্যুতি। ১৯৭৯ সালে আমি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার পদে যোগ দিই। ওই বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্ত হই। ওই সময় অশীনবাবুর আরেক চিঠি পাই, 'বিশ্বনাথকে ছেড়ে তুমি কি রবীন্দ্রনাথের কাছে আসবে?' বেনারস ছেড়ে ১৯৭৯-এর শেষে আমি বিশ্বভারতীতে লেকচারার পদে যোগ দিই। এরপরে সহকর্মী ও অধ্যাপক হিসাবে অশীনবাবুকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পাই।

আমরা জানি, অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে কলকাতা ও কেমব্রিজে অশীনবাবুর প্রতিষ্ঠা ১৯৫০-এর দশকেই সাধিত হয়। প্রখ্যাত অধ্যাপক ও গবেষক হিসাবে দেশে-বিদেশে তাঁর অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা দেখি ৬০-৭০-এর দশকে। স্বভাবতই তাঁর শিক্ষক-গবেষক জীবনের কিছু মর্মকথা এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। অশীনবাবুর গবেষণায় প্রাথমিক তথ্যনিষ্ঠতার একটা ছবি প্রায়শই উঠে আসে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় তাঁর *Malabar in Asian Trade* গ্রন্থটি প্রধানত ডাচ ভাষার উপাদানের ওপর রচিত। গবেষণার এই তথ্যনিষ্ঠতা তিনি তাঁর এম.এ ক্লাসের শিক্ষক ডক্টর নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর সুরাট গ্রন্থটি তিনি নরেনবাবুকেই উৎসর্গ করেছিলেন, সত্তরের দশকের শেষে যাঁর স্মৃতি অশীনবাবুর কাছে এক cherished memory। কিন্তু অশীনবাবুর লেখার স্টাইল ছিল অননুকরণীয়। মালাবার ও সুরাট দু'টি গ্রন্থই প্রধানত narrative স্টাইলে লেখা। স্বভাবতই তাঁর লেখায় ইতিহাসের গল্পটা সহজেই চোখে পড়ে, মন ভরে যায় তাঁর লেখার ভঙ্গিতে। বস্তুত তাঁর লেখায় এমনকি পাদটীকাও অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়। যেমন সুরাট গ্রন্থে একবার একটি বণিকের নাম নিয়ে সংশয় হলে উনি লেখেন—I admit defeat, কিন্তু narrative স্টাইলের হলেও তাঁর লেখায় বিশ্লেষণের কোনো অভাব ছিল না। সমগ্র অষ্টাদশ শতকের সমুদ্র বাণিজ্য নিয়ে মৌলিক গবেষণার পরিকল্পনা ওঁর ছিল, কিন্তু পরবর্তী জীবনের অসুস্থতা তাতে বাদ সেধেছিল। ১৯৮০-র দশকেও বেশ কিছু রচনায় এই সামগ্রিক ছবিটা দেবার চেষ্টা করেছেন, নতুন বিশ্লেষণও দিয়েছেন। হয়ত ছাত্রজীবনে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের প্রভাব এইসব বিশ্লেষণে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

আগেই বলেছি, ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অশীনবাবু অধ্যাপনা করেছেন। অবশ্য তাঁর অধ্যাপনার সিংহভাগ সময় গেছে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীতে। সব সময়, পড়বার সময় ভাবতে বলতেন, এবং যথেষ্ট ভেবে লিখতে বলতেন। তাঁর বিবেচনায়, অনেক পড়ার ছাপ থাকবে লেখায়, কিন্তু লেখা অযথা বড় হবে না। ক্লাস নেওয়ার জন্য নিজে প্রচুর পড়তেন এবং রোজ পড়তেন। কখনও নিজে বলেছেন, এক ঘন্টা ক্লাসের জন্য অন্তত চার ঘন্টা পড়া দরকার। ওঁর এক সহকর্মীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর পড়ানোর পুঁজি কতটা! তারপর নিজে বলেছিলেন, 'আমি দিন আনি, দিন খাই'। বোঝা যায়, ক্লাসের জন্য এবং সাধারণভাবেও, তাঁর নিত্য লেখাপড়াটা কত ব্যাপক ছিল।

আমার বিবেচনায়, অশীনবাবুর শান্তিনিকেতনবাস তাঁর জীবনে এক উল্লেখ্য অধ্যায়। কলকাতায় উনি ছিলেন আদ্যন্ত নাগরিক ব্যক্তিত্ব। শান্তিনিকেতনে এসে বললেন, 'আমি গ্রামে থাকি'। কিন্তু যে নিখুঁত মন আর মনন ওঁর চিরসঙ্গী, তাকে বাদ দিলেন না। সত্তরের দশকের কথা বলতে পারি না, শান্তিনিকেতনে আশির দশকের গোড়ায় অশীনবাবুর সৌরভ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই সময় বেশ কিছু দিন (এক বছরেরও বেশি) আমি তাঁর সহকর্মী হিসাবে বিশ্বভারতীর ইতিহাস বিভাগে পড়িয়েছিলাম। দেখেছি, কত বিচিত্র তাঁর বন্ধুগোষ্ঠী, কত বিদ্যোৎসাহী তাঁর মন, কিরকম সাংস্কৃতিক ও আন্তরিক পরিবেশ উনি চারপাশে গড়ে তুলেছেন। নানা দেশ থেকে অতিথি অধ্যাপকদের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। আমার থাকাকালীন সময়ে অক্সফোর্ড থেকে এসেছেন অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী। কত শিল্পী-সাহিত্যিককে বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছেন, কখনও সেই সব সময় আমাদেরও আমন্ত্রণ করেছেন। আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার করেছেন ইতিহাস বিভাগে, কত গুণীজনকে আহ্বান করেছেন। শান্তিনিকেতনের 'গ্রামীণ' পরিবেশ উজ্জ্বল, সাংস্কৃতিক বাতাবরণে ঢেকে গেছে। তাঁর স্ত্রী উমা দাশগুপ্তকে আগেই চিনতাম, কিন্তু শান্তিনিকেতনে আসার পর তাঁর পরিবারের সঙ্গে (ওঁর শ্বশুর মশাই, শাশুড়ি-মা এবং শিশুপুত্র অমিলের সঙ্গে) পরিচয়ের সুযোগ পাই। শান্তিনিকেতনে উমাদি তো আমার সহকর্মীও ছিলেন। পরে আমার বিয়ের নিমন্ত্রণের সময় অশীনবাবু বলেছিলেন (আমার বিয়ের কার্ড পড়ে), 'আমি কিছু জানিনা, তবে পাত্রীর (ওর নামও উমা ছিল) নামটি আমার খুব প্রিয়'। মনে হয় অশীনবাবু শান্তিনিকেতনের গ্রামীণ পরিবেশে আদ্যন্ত নাগরিক মন নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, স্বাচ্ছন্দ্য।

সত্তর ও আশির দশকে অশীনবাবু বাংলায় বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। এইসব লেখার কিছু সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। 'ইতিহাস ও সাহিত্য' তার অন্যতম। গান্ধীকে নিয়েও একটি রচনা সংকলন আছে। লক্ষণীয়, বেশির ভাগ বাংলা লেখাই শান্তিনিকেতন বাসের ফলশ্রুতি। মননশীলতায় অনবদ্য, এইসব রচনার স্টাইলও অননুকরণীয়। হয়তো বাঁকা কথা আছে, কিন্তু তার নিহিত অর্থও গভীর। অশীনবাবুর মননশীলতা যে ইতিহাসের গন্ডীও ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ তাঁর বাংলা রচনায় ছত্রে ছত্রে।

পরবর্তী জীবনে অশীনবাবুকে অধ্যাপনা ছাড়াও অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতে হয়েছে : ন্যাশনাল লাইব্রেরির ডিরেক্টর, এশিয়াটিক সোসাইটির এ্যাডমিনিস্ট্রেটার, বিশ্ব-ভারতীর ভাইস-চ্যান্সেলর। সেইসব কাজ উনি করেছেন, কিন্তু ওঁর মন পড়েছিল পঠন-

পাঠনে। জানিনা, এই বৈপরীত্য ওঁর মনের ওপর কোনও প্রভাব ফেলেছিল কিনা! নব্বুই-এর দশকের গোড়া থেকেই অশীনবাবু এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন এবং ধীরে তা বৃদ্ধি পায়। ওঁর মনন ক্ষমতা বজায় থাকে, কিন্তু দৈহিক ক্ষমতা আক্রান্ত হয়। পরে কথা বলাও জড়িয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর এই অবস্থাতেও উনি বিদ্যাচর্চা করেছেন, রচনা dictate করেছেন। সেইসব রচনার মানও অত্যন্ত উচ্চ। ভাবলে অবাক হতে হয়, প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে কতদিন এই দুরারোগ্য রোগকে ঠেকিয়ে রেখেছেন। ওই সময় বেশ কিছু দিন অশীনবাবু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। জীবনের সন্ধ্যায় এক প্রবল মননশীল ব্যক্তিত্ব নিজের সঙ্গে, দুরারোগ্য ব্যাধির সঙ্গে যে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তার নজির বিশেষ নেই। ওই সময় বেশ কয়েকবার তাঁর কাছে গিয়ে দেখেছি, এক অদ্ভুত রহস্যপ্রিয়তা ও পরিহাস-প্রিয়তা তখনও তাঁর মুখে লেগেছিল। ভাগ্যের কাছে পরাভব না মেনে আপন পুরুষকারের সহায়তাই নিয়ে গেছেন। এই অতুলনীয় সংগ্রামের ইতি ১৯৯৮ সালে, তাঁর জীবনাবসানে।

যে স্মৃতি ম্লান, ফ্যাকাশে হয়না, তাই বেঁচে থাকে। স্মরণে, মননে অশীনবাবুকে নিয়ে কিছু কথা—যা আমার অভিজ্ঞতায় ১৯৭০ থেকে ১৯৯৮-এর মধ্যে গড়ে ওঠে—তাই আজও বেঁচে থাকে। আজকের ছাত্র, আজকের অধ্যাপককেও তার মুখোমুখি হতে হয় নানাভাবে। কিভাবে পাঠ নেব আর কিভাবে পাঠ দেব—এ বিষয়ে অশীনবাবুর ভাবনায় একটা চমৎকারিত্ব ছিল। ইতিহাস পড়ানোর ক্ষেত্রে এবং ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রে অশীনবাবুর মননশীল সংবেদনের গুরুত্ব আজও সমধিক। কখনও তাঁর মননশীলতার আলো ইতিহাসের গন্ডীর বাইরেও পড়েছে। জীবনচর্যাতেও ছাপ তাঁর নিখুঁত মন ও মননের। মনে হয় বিদ্যাচর্চা আর জীবনযাত্রা তাঁর কাছে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত। হয়তো এই চলমান জীবন এক দীর্ঘ যাত্রা—নিরন্তর সংগ্রামেই সেখানে প্রতিষ্ঠা। জীবন সায়াহ্নে এক মহা শারীরিক সংকটেও এই সংগ্রাম চলতেই থাকে—জীবনাবসানেও যা ছাপ রেখে যায়। স্মরণে মননে অশীনবাবু তাই আজও প্রাসঙ্গিক।

আমার মাস্টারমশায় জগদীশ ভট্টাচার্য

তপোব্রত ঘোষ

"তোমাকে আমি পড়াবো, কিন্তু তার আগে তোমাকে আনলার্ন করতে হবে"।

উনিশশো চুয়াত্তর সাল। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি। বাংলা অনার্স সেকেন্ড ইয়ার। অ্যাডমিশন টেস্টে খুব ভালোভাবে উত্তরে যাবার পর প্রথম বছরের শেষ পরীক্ষাতেও প্রভূত নম্বর পেয়ে আমার মনে তখন একটু 'আমি' ভাব জেগেছে। তবুও আমাকে নিয়ে আমার ছোড়দি-র—কোকিলদি-র—একটা সংগত উদ্বেগ ছিল। তিনি বেথুন কলেজে ইংরিজি পড়াতেন। পরিবারের সকলের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে আমাকে বাংলা অনার্সে ভর্তি করিয়েছেন। ফলত আমার কিঞ্চিৎ উন্নতিকল্পে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয়ার্ধের কোনো এক নির্মল সকালবেলায় তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছেছেন দশ নম্বর রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের ছ'নম্বর ফ্ল্যাটে—জগদীশ ভট্টাচার্যের আস্তানায়। ভাইয়ের গুণাবলি খানিকটা শুরু করতেই ছোড়দিকে থামিয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, কাউকে তিনি আর পড়ান না; তারপর খানিকটা সৌজন্যের খাতিরেই "তুমি এত নম্বর পেয়েছ!" বলে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। সে কী সব প্রশ্ন! অর্ধেক প্রশ্নের তো মানেই বুঝলাম না, আর সামান্য যে দু-চারটের মানে বুঝেছি ভেবে উত্তর দিতে গেলাম—সেসব উত্তর আমার ওষ্ঠাগ্রে সূচিত হয়ে বিকশিত হবার আগেই তাঁর ভ্রূকুটিতে ভয় পেয়ে ওষ্ঠাগ্রেই মিলিয়ে গেল। তিনি কয়েকবার স্বগতোক্তি করলেন : "ভুল...সমস্ত ভুল..."। তখন আমার বিপর্যস্ত অবস্থা। একটুও দয়া না করে তিনি যে-শেষ প্রশ্নটা করলেন সেটা মর্মঘাতী : "চশমায় তো খুব আলো ঝল্‌কাচ্ছ—তোমার ও চশমার পাওয়ার আছে তো?" ধিক্কার জাগল তাঁর গলায় : "প্রেসিডেন্সি কলেজের এই অবস্থা! তোমার মতো মূর্খকে এত নম্বর দ্যায়!" ছোড়দি-র পাশে বসে এইবার আমার চোখে জল এল। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে ছোড়দি পড়াশুনোয় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মনে হল, আমি তাঁর সম্মান রাখতে পারলাম না। ভাবলাম, আর কি—এইবার উঠে পড়ি, বের করে দেবার আগেই বেরিয়ে যাই। ঠিক তখন আমার চোখের দিকে চোখ পড়ল সেই নিষ্ঠুর প্রশ্নকর্তার। কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। আর তারপর তিনি বললেন, "তোমাকে আমি পড়াবো, কিন্তু তার আগে তোমাকে আনলার্ন করতে হবে।"

তাই করলাম। সমস্ত ভুল শিক্ষা একে একে ভুললাম। শুধু পার্সেন্টেজের জন্য এর পরেও কলেজে গিয়েছি, গিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু সেখানে কিছু শিখিনি। দেখা কেমন সেটা অন্ধ রজনী দেখতে চেয়েছিল। আমি সামান্য মানুষ, তবু না চাইতেই শিখলাম শেখা কেমন, শিখে কী আনন্দ! এ কি আমার কম সৌভাগ্য! আমার নিজস্ব পৃথিবী ধীরে ধীরে জনবিরল হয়ে এসে শেষপর্যন্ত দুটি মাত্রয় গিয়ে ঠেকল : একজন ছাত্র, আর একজন মাস্টারমশায়।